Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ অক্টোবর, ২০২২

৪৫ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ২৪ অক্টোবর, ২০২২, সোমবার, ৬ কার্তিক, ১৪২৯

দুর্ভোগে কালনার হাজার হাজার বাসযাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ অক্টোবর : কালনার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এদিন সকাল থেকে বন্ধ হয়ে যায় বাস পরিষেবা। হঠাৎ এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন হাজার হাজার বাস যাত্রী। কালনা বাসস্ট্যান্ডের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির একদল বাস শ্রমিকের অভিযোগ, সংগঠনের নবনিযুক্ত সভাপতি ১৮ অক্টোবর রাতে তাদের সাথে অভব্য আচরণ করেছেন। তিনি ৪০-৫০ জন অসামাজিক লোকজন এনে সংগঠনের দপ্তরটি দখল করেছেন।

এমনকি বেশি বাড়াবাড়ি করলে তিনি গাঁজা কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন। এর প্রতিবাদে ১৯ অক্টোবর সকাল থেকেই একদল বাস শ্রমিক কর্মবিরতি শুরু করেন। ফলে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিক সংগঠনের নবনিযুক্ত সভাপতি শান্তি সাহা ওরফে বিট্টু বাস শ্রমিকদের তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, যারা এতদিন তোলা তুলে খেয়েছে, তাদের অসুবিধা হয়ে যাওয়ায় এখন মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। আমরা এটা চলতে দিতে পারি না। এই দুই গোষ্ঠীর দড়ি টানাটানিতে এদিন কালনা বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী।

সুগন্ধি ধানচাষ নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ অক্টোবর : কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এবং ধাত্রীগ্রাম এগ্রো ফার্মাস প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় সুগন্ধি ধানের চাষ নিয়ে একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ অক্টোবর কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় কালনা-১ ব্লকের ১০০ জন প্রগতিশীল কৃষক অংশগ্রহণ করেন। এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের সহ আধিকারিক ড. পার্থ ঘোষ, নিলয় কর, শুভেন্দু মণ্ডল প্রমুখ। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে ড. পার্থ ঘোষ জানান, এখন মানুষের খাদ্যাভ্যাসের বদল ঘটেছে। মোটা চালের পরিবর্তে শুরু চালের ভাত খেতে প্রায় সব মানুষই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে সরু চাল ও সুগন্ধি চালের চাহিদা বেড়েছে। কৃষকরা

মোটা ধানের পরিবর্তে যদি সরু ও সুগন্ধি ধানের চাষ করেন, তাহলে লাভবান হবেন। কৃষকদের লাভবান করার লক্ষ্যে আমন মরশুমে ১০০ হেক্টর সুগন্ধি ধানের চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। চাষ করার জন্য কৃষকদের বীজ, সার, কীটনাশক দেওয়া হয়েছে। তাদের এই চাষ ভালোভাবে করার জন্যই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তিগত এমনকি হাতের কলমে চাষ করার কৌশল শেখানো হয় কর্মশালায়।

'নতুন চিঠি' তার গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানায় দীপাবলি ও কালীপূজার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

৮৪ ঘন্টা অনশনরত চাকরিপ্রার্থীদের উপর নৈশ তাণ্ডব নজিরবিহীন : মহম্মদ সেলিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বাংলা ভাষায় করুণা, মমতা শব্দগুলোর মানে নতুন করে বার করতে হবে। চাকরিগুলো নিলাম করেছে তৃণমূল কংগ্রেস; তাদের সরকার। যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চনা করা হয়েছে। ৮৪ ঘন্টা অনশনের পর যেভাবে তাদের উপর তাণ্ডল করল বিধাননগরের পুলিশ তা নজিরবিহীন। সূর্যাস্তের পর কোনো মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয় না। এখানে হয়েছে।

আজ বর্ধমানে সিপিআই(এম) জেলা দপ্তরে এই কথাগুলি বলেন মহঃ সেলিম। তিনি আরও বলেন, সব চেয়ে বেশি নয়েজ পলিউশন তো উনি করেন। পুজোর উদ্বোধন করে রাজনৈতিক কথা বলেন।

আজ কেন, কাল সারাদিন প্রতিবাদ চলবে। সব বিবেকবান মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি চাকরি চুরির প্রতিবাদ করতে। ওই ছেলেমেয়েরা কি গোলমাল করছিল? সারা রাজ্য যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন রাতের অন্ধকারে পুলিশ লেলিয়ে দিলেন উনি। এভাবে মানুষকে দমিয়ে দিতে পারবেন ভাবলে উনি মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আজ পুলিশ পাগলের মতো আচরণ করছে। বামপন্থী হিসেবে আমরা মনে করি, যেখানে যেখানে নিয়োগ করা হয়েছে সেখানেই দুর্নীতি হয়েছে। কোনো ক্ষেত্র বাদ যায়নি। এর প্রতিবাদ চলবে।

ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ মিছিল জেলার সর্বত্র

নিজস্ব সংবাদাতা, মেমারি, ২১ অক্টোবর : গতকাল গভীর রাত্রে কলকাতার করুণাময়ী এলাকায় ২০১৪ ও ২০১৭ সালের প্রাইমারি শিক্ষক প্রার্থীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুব সংগঠন বিক্ষোভ দেখালো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি করেছে। একের পর এক তৃণমূলের নেতা ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত হওয়ায় জেল খাটছে, তাদের ঘর থেকে বিপুল পরিমাণে টাকা উদ্ধার হচ্ছে। যারা সত্যিকারের শিক্ষক হওয়ার যোগ্য তারা চাকরি পাচ্ছে না। তারই প্রতিবাদে কলকাতার করুণাময়ী তে হবু শিক্ষকরা ধর্ণায় বসেছিল, প্রায় ৮৩ ঘন্টা অনশনে ছিল। রাতের অন্ধকারে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন তখন নির্মম অত্যাচার করে পুলিশ তাদেরকে সেখান থেকে তুলে দেয়। কলকাতায় বাম ছাত্র যুবনেতাদের গ্রেপ্তার করে। এসবের প্রতিবাদে আজ পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বাম ছাত্র যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল মেমারি চকদিঘী মোড় লরি ইউনিয়নের অফিস থেকে শুরু করে মেমারি বাজার পরিক্রমা করে, স্টেশনবাজারে পথসভা হয়। মেমারি কালসি মোড়েও ছাত্র যুবরা রাস্তা অবরোধ করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তন্ময় মণ্ডল, সেখ রউফ, অন্তরা দত্ত, সোয়েল মল্লিক সহ অন্যান্যরা।

কালনা শহরের স্টেডিয়াম গেটের

—এরপর চারের পাতায়

পেঁয়াজের বীজতলা নষ্ট করলো দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৯ অক্টোবর : রোপণের আগে ঘাসমারা ঔষধ ছিটিয়ে পেঁয়াজের বীজতলা নষ্ট করলো দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটে পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নপারা গ্রামে। এই গ্রামের কৃষক কার্তিক দাস সাত কাঠা জমিতে পেঁয়াজের বীজ ফেলেছিলেন। এই বীজে ৪-৫ বিঘা জমি রোপণ করা সম্ভব হতো। গত ১৮ অক্টোবর রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা সমস্ত বীজের উপর ঘাসমারা ঔষধ স্প্রে করে দেয়। তার পরদিন থেকেই সবুজ পেঁয়াজ বীজ ধীরে ধীরে সাদা হতে আরম্ভ করে। এখন গোটা বীজতলা সাদা হয়ে গেছে। কার্তিক দাস স্থানীয় নাদনঘাট থানায় অভিযোগ করেছেন বলে জানা গেছে। কয়েকদিন আগে আর এক কৃষকের পিঁয়াজ বীজতলা এইভাবেই নষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই নাশকতামূলক কাজে যুক্ত দুষ্কৃতীরা ধরা পড়েনি।

গর্ভবতী প্রসূতিকে রক্তদান যুব কর্মীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ অক্টোবর : রাম রাজ্য খ্যাত হয়ে ওঠা উত্তর প্রদেশে এক বোতল রক্ত নিতে ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। সেখানে এই বাংলায় একজন গর্ভবতী মহিলাকে বিনা পয়সায় রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন একজন যুব কর্মী। ২১ অক্টোবর কালনা-২ ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝেরো গ্রামের গর্ভবতী মহিলা তিথি মালিক সাঁতরা কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর বি-নেগেটিভ রক্তের প্রয়োজন হয়। রক্ত না পেলে তাঁর জীবন নাশের আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু কালনা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত নেই। এই সংবাদ কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যুব কর্মী পাপন ভৌমিকের নজরে আসে। সে একজন রক্তদাতার সন্ধান করার সময় কালনা শহরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহিলা নেত্রী মৃদুলা রায়ের সাথে যোগাযোগ হয়। তিনিই কালনার বস্তি উন্নয়ন সমিতির নেতা শংকর পালের মেয়ে শর্মিষ্ঠা পালকে রক্ত দিতে রাজি করান। শর্মিষ্ঠা পাল কালনা হাসপাতালে রক্ত দিয়ে ওই প্রসূতির জীবন বাঁচান। রক্ত দেওয়ার পর রোগীর পক্ষ থেকে শর্মিষ্ঠাকে কিছু খাওয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু শর্মিষ্ঠা হাসিমুখে বলে দেন খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি ঠিক আছি।

মাটির প্রদীপ কারিগরদের উপর প্রভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ অক্টোবর : বিশ্বায়নের যুগে কৃত্রিম জিনিসপত্রের দাপটে চিরাচরিত জিনিসপত্রের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। তার প্রভাব পড়েছে পুজো-আচ্চায় মাটির তৈজসপত্রেও। বৈদ্যুতিক বাতির আগমন তার উপরে সরষের তেলের দাম আকাশচুম্বী হওয়ায় মাটির প্রদীপ নির্মাণশিল্প ধুঁকছে। দাবি কালনার পূর্ব সাতগাছিয়ার কুমোরপাড়ার মানুষের। দেওয়ালিতেও অর্ডার কম। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০১৫ সালকে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস হিসাবে ঘোষণা

করে। মাটি শুধু খাদ্যই উৎপাদন করে না, মাটি নানা ভাবে মানুষ ব্যবহার করে। সেই ব্যবহারের মধ্যে একটি হল, পুজোর তৈজসপত্র নির্মাণ। মাটির তৈজসপত্রের ব্যবহার কমলেও ডাবা, মাটির চাক, মুড়ি ভাজার খোলা ইত্যাদি এখনো তৈরি হয়। পরিবহণ ব্যয় অধিক হওয়ায় বাইরে বিক্রি কম। প্রাক্তন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ক্লাস্টার গঠন করে উৎপাদিত পণ্য বিশ্ববাংলা বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলা জুড়ে বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

২২ অক্টোবর আন্দোলনরত টেট চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে বর্ধমান শহরে নাগরিক মিছিল।

নতুন চিঠি

২৪ অক্টোবর, ২০২২

প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ

২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ হবু শিক্ষকরা ৫৮০ দিনেরও বেশি রাস্তায় বসে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছে। সরকারি রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে চালিয়ে যাওয়া আন্দোলন মানুষের নজর কেড়েছে। এদিকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর, প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য-এর গ্রেপ্তারি ও আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্তে সামনে এসেছে সরকারের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি। মানুষ জানতে পেরেছে সাদা খাতা জমা দিয়েও শুধু অর্থের বিনিময়ে যোগ্যদের বঞ্চিত করে কেমন করে অর্ধশিক্ষিত, অযোগ্যদের মানুষ-গড়ার কাজে নিযুক্ত করেছে তৃণমূল সরকার। প্রথমে দুর্নীতির কথা অস্বীকার করে, 'পরে যে করেছে সে দায়ী' বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছে সরকার। দোষীদের সাজা দেওয়া দূরস্থান, তাদের আড়াল করতে তৎপর হয়েছে সরকার। নতুন সভাপতি নিয়োগ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে আন্দোলন ভাঙতে আবার চাকরির খুড়োর কল ঝুলিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে নেমেছে। যাদের চাকরি চুরি হল তাদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি না দেখিয়ে নিয়ম দেখিয়ে বয়স-পার-হওয়া প্রার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি অগ্রাহ্য করে চলেছে। সঙ্গত কারণে মরিয়া চাকরিপ্রার্থীরা আমরণ অনশনের কথা ঘোষণা করে অনশনে বসে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে রাতের অন্ধকারে ১৪৪ ধারার কথা বলে অনশনস্থল থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনকারীদের টেনে হিঁচড়ে পুলিশ ভ্যানে তুলে আন্দোলন ভাঙতে পৈশাচিক বলপ্রয়োগ করেছে। এর প্রতিবাদে এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর কর্মীরা প্রতিবাদ করতে গেলে তাদেরকেও নির্বিচারে নির্যাতন ও গ্রেপ্তার করে বিক্রম দেখিয়েছে নির্লজ্জ সরকার।

শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ আন্দোলনকে ভাঙার এই ঘটনা নজিরবিহীন। 'লেসার ইভিল' বলে যাঁরা তৃণমূলের পক্ষে ২০২১ বিধানসভা ভোটের আগে সওয়াল করেছিল, সেই শীতঘুমে-যাওয়া বুদ্ধিজীবীরাও বুঝতে পারছে ফ্যাসিবাদী শক্তির দাঁত-নখ কত ধারালো। মুখ্যমন্ত্রী যিনি রাজপথে আটকে ২৬ দিন অনশনের নাটক করেছিলেন, যিনি ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ আন্দোলনের বিপক্ষে নন বলে বাণী বিতরণ করেছেন, তাঁর নির্দেশ ব্যাতীত এই পুলিশি তাণ্ডব এরাজ্যে অসম্ভব। কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করা নির্বাচিত সরকার এবং সংবিধানের কাছে দায়বদ্ধ প্রশাসকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু এসব কুকর্মই বেহায়া রাজ্য সরকার বাঁচার পথ হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চায়—বোঝাই যায় দুর্নীতিতে নিমজ্জিত শাসকদল কতখানি জনবিচ্ছিন্ন।

কিন্তু লজ্জা শব্দটা তৃণমূলের অভিধানে নেই। সিঙ্গুর থেকে টাটাদের তাড়িয়ে এখন তা 'সিপিএম করেছে' এহেন মিথ্যোচার যিনি করতে পারেন, তাঁর কাছ থেকে ন্যায়বিচার বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আশা করাই বৃথা। মানুষকে তাই শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ করতে হবে। চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করার নৈরাজ্য মানুষ আর মানবে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে জনবিচ্ছিন্ন শাসকদল এখন কোণঠাসা। মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় 'কে বন্ধু' 'কে শত্রু' চিনতে পারছে। সময় এসেছে দড়ি ধরে টান মারার, রানি খানখান হতে বাধ্য।

বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ২১ অক্টোবর : গ্রাম পঞ্চায়েতকে লুঠেরাদের হাত থেকে রক্ষা করার দাবিতে এদিন বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পরে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রধান দাবিগুলো হলো—১০০দিনের কাজ ও বকেয়া মজুরি প্রদান, নতুন পরিবারে জবকার্ড প্রদান, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রদান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় এসটি জাতিভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাকা ঘর দেওয়া, শৌচালয় উপভোক্তাদের তালিকা প্রকাশ, জল নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার, গ্রাম সংসদ সভা চালু করা প্রভৃতি। স্মারকলিপি দিতে যান আলেয়া বেগম ও সারাফৎ সেখের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল। দাবিগুলির সমর্থনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির সম্পাদক সাকাউৎ হোসেন, ছাত্রনেতা কৌশিক সরকার, আলেয়া বেগম, সারাফৎ সেখ প্রমুখ।

অন্ধকার থেকে আলোয় মুক্তির বার্তাবাহক শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়

অরিন্দম কোঙার

জন্ম ১৯৫৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। মৃত্যু ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। পূর্ব বর্ধমান জেলার মানকর-নিবাসী শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়। বাবা—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, মা—প্রমীলা মুখোপাধ্যায়। শ্যামলেন্দুরা তিন ভাই, চার বোন। বি এস-সি পড়ার সময় দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে সে চাকরি পায়। শ্যামলেন্দুর স্ত্রী টুলি মুখোপাধ্যায় খুবই অসুস্থ। তাদের একমাত্র সন্তান গবেষক বিজ্ঞানী শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী প্রযুক্তিবিদ পিয়ালী মুখোপাধ্যায় বিদেশে কর্মরত।

শ্যামলেন্দুর পার্থিব জীবন ৬৬ বছরের, কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবন ৫২ বছরের। শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে কর্মব্যস্ত এক মানুষ ২০০৭ সাল থেকে প্রথমে শারীরিক দিক দিয়ে, পরে মানসিক দিক দিয়ে ক্রমশ অক্ষম হয়ে পড়ে। তার দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার অংশ হিসাবে সে মানকর থেকে গলসী যাচ্ছিল এক সভায় যোগ দিতে। ট্রেন দুর্ঘটনা। প্রাণে বাঁচল, কিন্তু কাজ করায় নয়।

কী কাজ? নিজের জন্য কাজ, পরিবারের জন্য কাজ, সমাজের জন্য কাজ, দেশের জন্য কাজ, বসুন্ধরার জন্য কাজ। অর্থাৎ নিজেকে সমষ্টির মধ্যে রেখে কাজ। কিন্তু কাজটা কী? কাজ মানুষের রুটি-রুজির জন্য। সুস্থ-সুন্দর পরিবেশের জন্য। কাজ মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডকে বিকশিত করার জন্য। কাজ মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর জন্য। সেই স্বপ্ন শোষণ-বঞ্চনা- নির্যাতন-নিপীড়নমুক্ত সমাজের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন শুধু দেখলে হয় না, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। সুতরাং কাজ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু সংগ্রাম গড়ে তুলতে সংগঠন চাই। সুতরাং কাজ সংগঠন শক্তপোক্ত করে তোলার জন্য।

শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায় বিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে এইভাবে কাজ করার জন্য নিজেকে তৈরি করেছে। তাকে প্রভাবিত করেছেন তাঁর বড়দা, সুনীল মুখোপাধ্যায়। বিশ শতকের সাতের দশক। পশ্চিমবঙ্গে এক দুঃসহ পরিস্থিতি। আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস। সারা দেশে জরুরী অবস্থা। খুন-জখম, মিথ্যা মামলা, জেল, এলাকা থেকে বিতাড়ন। তারই মাঝে নতুন উদ্যোমে নতুনভাবে যুব সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ। গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। ১৯৬৮ সাল থেকে।

বুদবুদ-গলসী এলাকায় এইভাবে যুব সংগঠন গড়ে তোলার কাজ যারা শুরু করে, তাদের অন্যতম বিজয় মণ্ডল। গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য হয় ১৯৭৫ সালে। পরে অবশ্য বিজয় যুব আন্দোলনের বৃত্তে থাকতে পারেনি।

সেই শূন্যস্থান পূরণ করে শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়। যুব ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য হয় ১৯৮১ সালে। বুদবুদ-গলসী এলাকায় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনকে দাঁড় করাতে শ্যামলেন্দুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ১৯৮০ সালে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনে পরিণত হয়। এই উত্তরণ পর্বে সে এই ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরেছে। এটা কত গর্বের! সর্বভারতীয়স্তরে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন যখন প্রসারিত হয়েছে, তখন অবিভক্ত বর্ধমান জেলাতেও সংগঠন বিস্তার লাভ করেছে আর এই কাজে অংশীদার হয়েছে শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের বুদবুদ লোকাল কমিটি, পরে বুদবুদ-গলসী জোনাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছে। যুব সংগঠনের পরে কৃষক সংগঠনের কাজে নিজেকে যুক্ত করেছে।

বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায় পাকাপাকিভাবে প্রবেশ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সভ্য হিসাবে ১৯৭৮ সালে। এখানেও শেষ পর্যন্ত পার্টির বুদবুদ-গলসী জোনাল কমিটির সদস্য হয়। ক্রমশ এগোতে থাকে। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হয়। কিন্তু হঠাৎ দুর্ঘটনায় পড়ে। ছন্দপতন। বয়সে নবীন হলেও তাঁর নেতৃত্ব প্রবীণ পার্টিসভ্যরা সানন্দে গ্রহণ করেন তার নীতিগত অবস্থান, সমষ্টিগত ভাবনা, ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য। শ্যামলেন্দু সুবক্তাও ছিল।

শ্যামলেন্দু যখন দক্ষতার শিখরে, তখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার। একদিকে সংগ্রামের সহায়ক শক্তি, অপরদিকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা লাঘবে উন্নয়নে দায়বদ্ধ শক্তি। এই আবর্তের মধ্যে শ্যামলেন্দুর উন্নয়নের কর্মসূচির মধ্যে ছিল গ্রামীণ হাসপাতাল, কলেজ, বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন, অডিটরিয়াম, গ্রন্থাগার ইত্যাদি। অবশ্যই উদ্যোগ একক নয়, উদ্যোগ সমষ্টিগত, শ্যামলেন্দু অন্যতম পুরোধা। 'ঠাকুর' নামে জনপ্রিয় শ্যামলেন্দু যুবক-যুবতীদের আকর্ষণ করতে পারত, তাদের নিয়ে গ্রহণ করতে পারত নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। দেওয়াল লিখন, অভিনয়, আবৃত্তিতে সে ছিল পারদর্শী। গড়ে তুলেছিল 'আমরা ক'জন' নামে সংস্থা। এক কথায় যথার্থ এক সামাজিক মানুষ।

আর কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ধারণা কী ছিল? কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী পার্টি। রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তন করার পার্টি। শ্রেণিশোষণের অবসান ঘটাতে শক্তির সমাবেশ করার জন্য পার্টি। শ্যামলেন্দু তাঁর অনুজ সহযোদ্ধাদের এইভাবে শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছে। নেতা হিসাবে কর্মসূচি রূপায়নের কেবল নির্দেশ নয়, কর্মসূচি গ্রহণে আলোচনা, তাঁদের কাছে কর্মসূচি ব্যাখ্যা ও একসঙ্গে রূপায়ণ। ফলে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি, যৌথভাবে কাজ, নেতৃত্বের সামনে থেকে কাজ ছিল তার বৈশিষ্ট্য।

২০০৭ থেকে ২০২২। শারীরিক কর্মক্ষমতা, মানসিক কর্মক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি ক্রমশ কমে এসেছে, কিন্তু প্রতি বছর ছোট একটা পকেট ডায়েরির জন্য তার আগ্রহ থেকে গেছে। ডায়েরিতে সে লেখেনি, লিখতে পারেনি, তবু আগ্রহ এতটুকু কমেনি। কেন? ডায়েরিটা ছাপে ও প্রকাশ করে গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ডায়েরিতে উল্লেখ থাকে বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যেমন, প্রথম দিন, ১ জানুয়ারি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা—১৯৫৯ সালে কিউবার বিপ্লবী ফৌজের সাধারণতন্ত্র ঘোষণা। প্রথমেই মুক্তির ঘটনা। কিউবায় বিপ্লব সফল হয় ১৯৫৯ সালে ১ জানুয়ারি। বিপ্লবের রূপকার ফিদেল কাস্ত্রো ৪০ বছর পর ১৯৮৯ সালে বলেন, ''কিন্তু সব থেকে বড় কথা কমিউনিস্টদের হতে হবে সাহসী আর বিপ্লবী। যে কোন পরিস্থিতিতে তা যত প্রতিকূলই হোক না কেন, সংগ্রাম করতে কমিউনিস্টরা কর্তব্যবদ্ধ। প্যারিসের কমিউনার্ডরা (কমিউনার্ডরা হচ্ছেন ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের বিপ্লবীরা—লেখক) তাঁদের আদর্শের পক্ষে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বিনা সংগ্রামে বিপ্লব আর সমাজতন্ত্রের পতাকা সমর্পণ করার কথা ভাবাও যায় না। কাপুরুষ এবং হতাশাবাদীরাই আত্মসমর্পণ করে; কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা নয়।'' (কিউবা : বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা) মনে হয়, ডায়েরিতে লিখতে না পারলেও ডায়েরির মাধ্যমে কাস্ত্রোর এই বলিষ্ঠ ঘোষণা শুনতে চাইতো শ্যামলেন্দু।

ভারতের সেই মুক্তি কীভাবে অর্জিত হবে, সেই বার্তাও এই ডায়েরির শুরুতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচি থেকে। তা হচ্ছে : ''ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাতে চেষ্টা করে। একটি শক্তিশালী বিপ্লবী আন্দোলন বিকশিত করে পার্লামেন্টীয় ও পার্লামেন্ট-বহির্ভূত সংগ্রামী রূপের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণি ও তার মিত্ররা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রতিরোধকে পরাজিত করতে যথাযথ চেষ্টা করবে, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সব রূপান্তর সংঘটিত করতে।''

''যা হোক, এটা সব সময়ে মনে রাখা দরকার যে শাসকশ্রেণিরা কখনো স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা পরিত্যাগ করে না। তারা জনগণের ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করে বে-আইন ও হিংসার সাহায্যে জনগণের ইচ্ছার উল্টোটা করতে চেষ্টা করে।''

''সেজন্য বিপ্লবী শক্তিগুলির হুঁশিয়ার থাকা দরকার এবং এমনভাবে তাদের কাজকর্মের ধারা স্থির করা দরকার যাতে তারা সমস্ত রকম অবস্থার মোকাবিলা করতে পারে; পারে দেশের রাজনৈতিক যে কোন বাঁক ও মোড়ের সম্মুখীন হতে।''

শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায় তো এইভাবেই কাজ করার চেষ্টা করতো।

আমাদের অনুজ, আমাদের সহযোদ্ধা শ্যামলেন্দু। শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায় মুক্তির বার্তাবাহক হয়ে উঠেছিল। শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্তি। শ্যামলেন্দু নেই, কিন্তু তার বার্তাবাহকের ভূমিকা জাগরুক আছে আর আছে সেই মুক্তির বার্তা। তাই শ্যামলেন্দু আমাদের মাঝখানে আছে ও থাকবে। তবে সেখানে আমাদের দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব নিজেদের বার্তাবাহকের যোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা, আরও আরও বেশি করে বার্তাবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করা।

১৯৮১ সালে কাটোয়ায় অনুষ্ঠিত যুব ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা ষষ্ঠ সম্মেলনে আলোচনা করছেন শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

ইতিহাস সাক্ষী

ঘনশ্যাম সরকার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আজ থেকে ৭৫ বছর আগে এদেশে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ আমরা স্মরণ করি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনের ধারা, চরমপন্থী আন্দোলনের ধারা এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের ধারা মূলত এই তিনটি ধারার আন্দোলনের ফলেই দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ ছিল ভারতের প্রথম বৃহৎ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। তারপর ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের শুরুতে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্রতর হয়েছিল। তাই ১৯০৫ সালে তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বিভাজন ও শাসন নীতি গ্রহণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করা। শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যা স্বদেশী আন্দোলনকে তীব্রতর করে। ব্রিটিশ সরকার মনে করে যে কলকাতা থেকে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে তাই ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯১৯ সালে ভারতীয়দের স্বাধীনতা খর্বকারী রাওলাট আইনের প্রতিবাদে সংগঠিত সভায় ব্রিটিশ সরকার নির্মম হত্যালীলা করে যা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত। এই হত্যাকাণ্ডের পর দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো আন্দোলন সংগঠিত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আদিপর্বে নরমপন্থীদের কার্যকলাপে স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। নরমপন্থী নেতাদের আবেদন-নিবেদন নীতি, সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদি কোনোটাই ব্রিটিশদের বিচলিত করতে পারেনি, বিপুল জনসমাজেও কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। তরুণ প্রজন্মের মনে যখন হতাশা বাসা বাঁধতে শুরু করে তাদের আশা পূরণ করতে এগিয়ে আসে নতুন নেতৃত্ব, যাদের দাবি ছিল স্বরাজ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস এই নতুন প্রজন্ম চরমপন্থী নামে পরিচিত। জাতীয় আন্দোলনকে গতিশীল ও সংগ্রামমুখী করে তুলতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর আজাদহিন্দ বাহিনীর ভূমিকা আমরা সকলেই জানি। এর পাশাপাশি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে দেশের শ্রমিক কৃষকদের সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সামন্ততন্ত্রের বিলোপ ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সব শ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উদ্যোগে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-সহ সমাজের সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণে আতঙ্কিত ব্রিটিশ শাসকের কঠোর দমনপীড়নের শিকার হন কমিউনিস্টরা। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলাগুলি (পেশয়ার, মীরাট, কানপুর) ছিল এই দমনের কদর্যরূপ। ১৯২০ সালে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯২১-২২ সালেই কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে প্রথম পূর্ণ স্বরাজের দাবি তোলে কংগ্রেস এই দাবি তোলার ১০ বছর আগে। স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় সব ধরনের আপসকামিতা, সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের শিক্ষা থেকে বিভিন্ন স্রোতের সেরা ও সবচেয়ে যোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধারা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করে একমাত্র কমিউনিস্টরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর দেশজুড়ে শ্রমিক, কৃষক, নাবিক ও অন্যান্য আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্টরা। এই সময় ব্রিটিশ আক্রমণ তীব্র হয় কমিউনিস্টদের উপর। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য হিটলার সোভিয়েত আক্রমণ করছে তখনই কংগ্রেস আহুত ১৯৪২-এর আন্দোলন লড়াইয়ের নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পরে কংগ্রেস নিস্তেজ হয়ে যায়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর মুক্তির জন্য কমিউনিস্টরাই সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের ঐতিহ্যের অধিকারী। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই থেকে এক মুহূর্তের জন্য কমিউনিস্টরা বিরত হয়নি। ১৯৩১ সালে করাচি অধিবেশনে স্বাধীনতার পর সামাজিক বৈষম্য দূর, মৌলিক অধিকার, শ্রমিক কৃষকদের দাবি পূরণের দাবি কমিউনিস্টদের চাপেই গৃহীত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরত্বপূর্ণ আপসহীন ভূমিকায় বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটে। সেই সময় ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সেনানীরা দীপান্তরে যাবার পূর্বেই অথবা কারাবাসকালে কমিউনিজমকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দিদের বড় অংশ পরবর্তীকালে সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক হন। যদিও দেশের বিভেদকামী অশুভ শক্তি কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করছে। দেশে চরম সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্তসুলভ বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকেই বদলে দিতে চাইছে। বিজেপি তাদের পূর্বসূরি হিন্দু মহাসভা, আরএসএস যাদের ব্রিটিশ তোষণ এবং বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভূমিকা নেই তারাই আজ সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক সাজতে চাইছে। আন্দামান সেলুলার জেলের ফলক খুলে ফেললেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অবদান মুছে ফেলা যায় না।

১) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মজুফফর আহমেদকে ব্রিটিশ সরকার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

২) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক গণেশ ঘোষ দীর্ঘ ১৬ বছর সেলুলার জেলে কারাবাসের পর সিপিআইএম-এর এমপি এবং এমএলএ হন।

৩) কল্পনা দত্ত, যিনি ছিলেন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অন্যতম, ৬ বছর দীপান্তরের শেষে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

৪) সুবোধ রায়, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কনিষ্ঠ সৈনিক। কারাবাসের পর সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির আজীবন সদস্য।

৫) অম্বিকা চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ১৬ বছর কারাবাস শেষে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং এমএলএ নির্বাচিত হন।

৬) হরেকৃষ্ণ কোঙার, ৬ বছর আন্দামানে দীপান্তর শেষে দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব। সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন।

৭) লক্ষ্মী সায়গল, আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঝাঁসির রানি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন, আমৃত্যু ছিলেন সিপিআই(এম)-এর সদস্য।

৮) পি সি যোশী, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন শেষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক।

৯) ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, ১৯৩৪-৪২ ব্রিটিশ সরকারের ওয়ান্টেড লিস্টে যৌবনের অর্ধেক সময় কাটিয়ে কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়াও ছিলেন শিব ভর্মা, শওকত উসমানী, জয়দেব কাপুর, অজয় ঘোষ, কিশোরী লাল, সতীশ পাকরাশী, অরুনা আসফ আলি, বি টি রণদিভে, সুবোধ চৌধুরী, বিনয় চৌধুরী। এঁরা ছাড়াও ছিলেন অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁরা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সরাসরি দেশসেবার কাজ করেছেন।

অপর দিকে রয়েছে আরএসএস। দেশের তরুণরা মুক্তির মন্দির সোপান তলে যখন আত্মবলিদান দিয়েছে, তখন কী ভূমিকা নিয়েছিল আরএসএস। আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ সালে। প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ার পরে এম এস গোলওয়ালকর আরএসএস-এর পরিচালক হন। স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আরএসএস-এর দৃষ্টিভঙ্গি হল এটা একটি প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন (চিন্তায়তন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫)। ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা আরএসএস সর্বদাই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বা শান্তিপূর্ণ কোনো সংগ্রামেই অংশগ্রহণ করেনি। আরএসএস ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেই স্বীকার করে না। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের শত-সহস্র বছরের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এবং পরিশেষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে একই শোষণ-যন্ত্রণা, একই অত্যাচার বঞ্চনার শিকার হওয়ার কারণে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে ভারতের গড়ে ওঠাকেই তারা অস্বীকার করে। পরাধীন ভারতে তাদের শত্রু ব্রিটিশরা ছিল না, ছিল মুসলমান এবং কমিউনিস্টরা। এখনও তারা শোষক পুঁজিপতিদের নয় শত্রু মনে করে মুসলিমদের এবং কমিউনিস্টদের।

হিন্দু মহাসভাই প্রথম দেশভাগের দাবি তুলেছিল : সংঘ পরিবারের দেশ সেবকরা দেশভাগের জন্য একতরফাভাবে মুসলিম লিগ ও মুসলিম মৌলবাদী শক্তিকেই দায়ী করে। ১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ লাহোরে লিগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মুসলিম লিগ পৃথক দেশ গঠনের দাবি তোলে। কিন্তু তার অনেক আগেই ১৯২৩ সালেই হিন্দু মহাসভার নেতা বি ডি সাভারকার ধর্মভিত্তিক পৃথক দেশের ধারণা উপস্থিত করেন। তিনি 'হিন্দুত্ব' নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান দুটি পৃথক জাতির তত্ত্ব পেশ করেন।

ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন গোটা দেশে ১৯২১-২২ সালে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত পার্থক্য গৌণ করে হাজার হাজার মানুষ এক হয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। এই গণসংগ্রামের মধ্যে আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ার দেখতে পেলেন 'অশুভ শক্তির জাগরণ'।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন থেকে তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। ১৯২৯ সালে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লি এ্যাসেম্বলিতে বোমা নিক্ষেপ করলেন, উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে আলফ্রেড পাকে ১৯৩১ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। ১৯৩১ সালে ২৩শে

—এরপর চারের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

খড়কুটো

ধারাবাহিক উপন্যাস

কাকলি ঘোষ

—গত সংখ্যার পর

—তোমরাও আমাদের সঙ্গে এস না। বস্তিটা ঘুরবে, নন্দিতা বলে।

—দেখুন দিদিমণি, আপনাকে বারণ করে দিচ্ছি বস্তিতে আর ঢুকবেন না।

—কেন ঢুকবে না, বস্তি কী তোদের বাপের কেনা? পারুল বলে।

—আমরা এখন বাড়ি বাড়ি যাব। আজ সন্ধ্যে বেলায় কাঁসর ঘন্টা বাজাতে হবে। করোনা দূর হবে। ছেলেগুলো বলে।

নন্দিতা হেসে বলে—কে বলেছে এসব কথা! এতে কখনো করোনা যায়? এটা একটা রোগ, মহামারী। প্রচণ্ড ছোঁয়াচে, তোমরা আমাদের সঙ্গে এসো, চলো বাড়ি বাড়ি ঘুরি। আর তোমরাও এভাবে দল বেঁধে একসঙ্গে থেকো না।

—দিদিমণি, আপনার কাজ নেই? নিজের কাজে যান। আমাদের বিরক্ত করবেন না।

নন্দিতারা আর কথা বাড়ায় না। মোটামুটি সব জিনিস ওরা বিলি করতে পেরেছে। নন্দিতা বাড়ির পথ ধরতে ধরতে ভাবে ও কি পারবে এই বিরাট কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারকে দূর করতে? বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্যসচেতন করতে, ওদের বোঝাতে, মোমবাতি জ্বালালে বা কাঁসর ঘন্টা বাজালে করোনা দূরে যাবে না।

নন্দিতা ভাবে এই যুক্তিহীনতা কেবল অশিক্ষা নয়। সরকারি প্রচারও আছে। এইসব কাঁসর ঘন্টা বাজানো, মোমবাতি জ্বালানো এভাবে ক্রমশ পরিকল্পনা মাফিক যুক্তিহীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে গরিব মানুষদের। নন্দিতা ভাবে, বড় দুঃসময় আজ। রাষ্ট্র কোমর বেঁধে নিমেছে মানুষকে ক্রমশ ভাগ্যনির্ভরতার দিকে ঠেলে দিতে। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে।

সঙ্গীসাথীরা যে যার বাড়ির পথে চলে গেছে। নন্দিতা একাই ফিরছে। রাস্তা শুনশান। সাড়ে সাতটা বাজে। নন্দিতা ভাবে ইস্ দেরি হয়ে গেল অনেকটা। মা ভাববেন। গলির মুখেই নতুন বাড়ির সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা। আসতে যেতে নন্দিতা লক্ষ্য করেছে ও বাড়ি থেকে বেরোলেই ছেলেটি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। নন্দিতা গুরুত্ব দেয়নি। আজও তেমনি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। ছেলেটি সাইকেল থেকে নেমে বলল—শুনুন। আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। একবার আমাদের বাড়ি আসবেন?

—কেন? আপনাদের বাড়ি যাব কেন?

—না মানে আমার মায়ের দুদিন ধরে জ্বর। কিছু খেতে পাচ্ছেন না। স্বাদ পাচ্ছেন না খাবারে। গন্ধও পাচ্ছেন না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

—সে কী! দুদিন ধরে ওনাকে বাড়িতে ফেলে রেখেছেন? হাসপাতালে নিয়ে যাননি, আর আপনিও বাইরে বেরিয়েছেন! মায়ের টেস্ট করিয়েছেন? আপনারও তো টেস্ট করানো দরকার।

—না। বাড়ির বাইরে না বেরোলে আপনাকে পেতাম কোথায়? একটু যদি আসেন।

—ঠিক আছে। আপনার বাড়িতে অক্সিমিটার আছে?

—না না সে সব তো কিছু নেই।

—আচ্ছা আসুন আমার সঙ্গে। আমারটা নিয়ে যান। কাল একটা কিনে নেবেন। অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা দেখুন। তারপর ডাক্তারের সঙ্গে ভিডিও কল করিয়ে দেব। তারপর দেখুন কী হয়।

—ম্যাডাম, আপনার ফোন নম্বরটা যদি দেন।

—আপনার ফোন নম্বরটা দিন বরং। আমি ফোন করে নেব। ডিউটিতে থাকলে তো আমাকে পাবেন না।

(চলবে)

বিলকিসের জন্য কয়েক ছত্র

অশোক অধিকারী

আমি সালেহার জন্যে এক টুকরো ঈদের চাঁদ এনেছি
তুমি দেখবে না বিলকিস!
কাস্তের ফলার মতো ভেসে থাকা আকাশের লজ্জায়
আমাদের সন্তানের রক্ত ঘিলু আর মাংসের সহবাস।
সেদিন আজানের সুরে ছিল ক্রন্দনের ভাষা
তোমার নিথর শরীরের প্রাগৈতিহাসিক মৃত্যুদণ্ড
দিয়ে ওরা কিনতে চেয়েছিল ইজ্জতের শরম!
তোমার আর তোমাদের দখলনামায় সেদিন
ভিটেচ্যুত হয়েছিল ইনসাফ! শেষবার তোমার
সন্তানের চুমু ভিক্ষে করে তুমি পেয়েছিলে
বাউন্ডুলে উল্লাস। যেন অরণ্যের বৈধব্য।

আজ যখন গাঁদা ফুলের মালায় রাষ্ট্রের হলফনামা,
যখন কবরের মাটিতে শস্য হয়ে ফুটেছে
তোমার সালেহা; তখন এগারোটি পার্থেনিয়াম
বিষের টোপর নিয়ে রাস্তা আটকেছে অধিকারের।
এত অন্ধকারে তুমি কি হাতে নিয়েছ হলফনামা,
এখনও চাঁদ ওঠে বিলকিস—এখনও গ্রহেরা রাত জাগে।
আরও এক অভিযানে তুমি হবে মেঘছেঁড়া রোদ।
এখনও সূর্যের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া বাকি শোকের বারুদ!

জীবন

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

জীবন মানে ভাঙাগড়া, জীবন মানে লড়াই
জীবনজয়ের মন্ত্র দিয়ে মনটাকে আজ ভরাই
জীবন মানে পথের শপথ, জীবন মানে বাঁধন
জীবন মানে ঘামঝরানো, নয়তো ভীরুর কাঁদন
জীবন মানে হাত মেলানো, জীবন মানে ফোটা
জীবন মানে দুঃখ নিয়েও আলোর জন্য ছোটা
জীবন মানে মানবতা, জীবন মানে শ্লোগান
জীবন মানে উড়িয়ে নিশান সম্প্রীতিরই গান
জীবন মানে কাস্তে হাতে সোনালি ধান কাটা
জীবন মানে একই সাথে পাশাপাশি হাঁটা
জীবন থেকে অন্য জীবন খুঁজতে খুঁজতে বাঁচি
জীবন পথে, এই শপথে, থাকবো কাছাকাছি।

পাঠাগারের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ অক্টোবর : কর্মচারীবিহীন গ্রামীণ পাঠাগারের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন উৎসব কমিটি। কালনা-১ ব্লকের কৃষ্ণদেবপুর দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ ও গ্রামীণ পাঠাগারের এই পূর্তি উৎসব শুরু হবে আগামী ৩০ অক্টোবর রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে। ৪-৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বই মেলা, বিভিন্ন সাংস্কৃত অনুষ্ঠান, গুণীজন সংবর্ধনা। উল্লেখ্য ১৯৮০ সালে সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া এই গ্রন্থাগারে বর্তমানে কোনো কর্মচারী নেই। তবুও ১১৮ জন গ্রাহক নিয়মিত বই আদান-প্রদান করেন। এটা সম্ভব হয়েছে ২০১৯ এবং ২০২০ সালে অবসর নেওয়া লাইব্রেরিয়ান ও অ্যাটেনডেন-এর জন্য। তারা অবসর নিলেও এখনো পর্যন্ত প্রতিদিন এই গ্রামীণ গ্রন্থাকারে এসে কাজ করেন। তাদের এবং পরিচালন কমিটির মহানুভবতায় ৫০ বছর পূর্তি উৎসবটাও হচ্ছে। কোনো সরকারি অনুদান নেই। জনগণের অর্থেই এই উৎসব হবে বলে এদিন জানানো হয়।

সিপিআই(এম) দরদীর অকালপ্রয়াণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ অক্টোবর : সিপিআই(এম) ঘনিষ্ঠ রাজকুমার বিশ্বাসের (৫০) অকালপ্রয়াণ হয়েছে। গত ১৮ অক্টোবর বাড়িতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে কালনা হাসপাতলে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার আরো অবনতি হলে কল্যাণী গান্ধী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯ অক্টোবর দুপুরে অস্ত্রোপচারের পর সেখানেই এদিন রাত্রি ৮-২৫ মিনিট নাগাদ তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে খুব সম্প্রতি কর্মস্থল বিশাখাপত্তনম থেকে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। তিনি বাড়িতে থাকতে পার্টির কাজে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকতেন। এমনকি

২০১১ সালে তিনি আক্রান্ত হন। সম্প্রতি বাইরের রাজ্যে থাকলেও এলাকার পার্টি নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। কল্যাণী থেকে মৃতদেহ কালনা-২ ব্লকের সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের শতপটি-মালোপাড়া গ্রামের বাড়িতে আনা হয়। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কমল রায়, অনুকুল বিশ্বাস, মণীন্দ্র সরকার, রঞ্জিত রায়, স্বপন সরকার, মোহন সরকার, প্রেম হালদার প্রমুখ। তাঁর অসুস্থ মা এবং স্ত্রী বর্তমান।

প্রান্তজন—আত্মজন (৭৪)

রত্না রশীদ

আমার ধারণা এখনের এই সর্বজনীন পুজো আয়োজকরাও খুব ভালো মতো জানে দেব-দেবী বলে কিছু নেই, শুধুই বেওসা। নিজেদের নাচা-গান-খানায় সম্বৎসরের খোরাক তুলে নেওয়া। বর্তমান সরকার এই 'লুটে নেওয়া পুজো'র ধুনোয় বাতাস জোগাতে ষাট হাজার করে ক্লাব প্রতি উপহার দিচ্ছে। যতো জমজমাট, ততো কামাই। এটা তো দেখানো, লুকানো আরো কতো যে মাল-মশলার আমদানি—সে খবর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না। মহালয়ার আগেই কাঁচি ধরে দৌড়োচ্ছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। নেয়ে, গেয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে ভক্তিমতী কমলায় নেত্য করে থমকিয়ে থমকিয়ে। এতো বড়ো ডিগনিফায়েড একটা পোস্টে বসে থেকে রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীকে এমন একটা কমিক ক্যারেকটার উপহার দেবার তুলনা পুরোটা দেশেও অমিল।

পুজোতে যা করবেন তিনি এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা করবেন। বেচাকেনা লেনাদেনা নেত্যগীত চুরি চামারি ভণ্ডামি গুণ্ডাবাজি সব তেনাদের দখলে এবং এরই নাম সর্বজনীন পুজো। অসৎ লোকজন অসৎ কাজ করবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যারা মূল্যবোধের বিন্দুমাত্রও ধার ধারি, তারা কেন দল বেঁধে ওই পুজোতে অংশগ্রহণ করি, সেটা আমার বোধে আসে না। কেন যাবো ওদের দলভারি করতে? দুনিয়ার নোংরা মাখা কোটি কোটি টাকা বাজেটের পুজো, তাতেও সর্ষের দানার মতো গিজগিজে মাথার অজগরী সুদীর্ঘ লাইন। আমরা মানুষকে বোঝাতে পারিনি, নিজে হাতে করে অন্যায় না করলেও, অন্যায়কারীর কাজে সমর্থনটাও অন্যায়ই, বরং আরো বড়ো মাত্রায় অন্যায়।

বাচ্চাগুলো কি শিখছে এইসব ভোগবাদী অভিভাবকদের কাছে? যতো চকমকে ততো ভালো, চলো তার পেছনে দল বেঁধে চলো। একজন এই দেশেরই অধিবাসী মানুষকে কেমন সেজেগুজে গয়নাগাটি পরে সপরিবারের সাপোর্টে কেমন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে, —চলো দেখতে যাই সপরিবারে হত্যার কতো আনন্দ। চরম অত্যাচারীকেও যে প্রাণে মেরে দেওয়া চলে না, এই শিক্ষা এই খুনে রাজনীতির সংস্কৃতিতেই এলো না। শিশুমন প্রথম দর্শনে আতঙ্কিত হয় এমন কুৎসিত হত্যাদৃশ্য দেখে, অনেক শিশুকে দেখেছি মহিষাসুরের বুকে খোঁচানো রক্তের নৃশংসতা দেখে কেঁদে কেটে প্যান্ডেল ছেড়ে চলে যেতে। এই সুন্দর অপাপবিদ্ধ মনগুলোকে পলে পলে নিষ্ঠুরতার দৃশ্যশ্রাব্য ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে ভক্তপ্রাণ অভিভাবক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত হাতকাটা কানাই, কান ওড়া পেটো, শ্মশান স্বপন, শিড়িঙ্গে ভোম্বল এদের পরিপাটি নির্মাণ করে। উৎসব-সিজিনে তো বটেই, সারাটা বছর ধরে খালের ধারে যুবক, বিলে ভাসছে যুবতী, ঘরের ভেতর খুন হয়ে যাওয়া পুরো সংসার, রাজপথে কুপিয়ে খুন, পানশালায় দিনদুপুরে গুলি গোলা ...অসংখ্য—অজস্র। কতো একটা একটা করে ঘটনা ঘটবে আর মায়াকান্নার বান ছোটাবো আমরা! গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে ঘণ্টা হবে। হত্যা, নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতার 'পূজা' মানবিকতার ফুল কক্ষনো ফোটাতে পারে না। আমড়া কাছে আম ফলিবেক নাই। তথাকথিত ধর্ম্ম যতো অনিষ্ঠের মূল। শিল্প দেখাবার জন্যে ধর্ম্ম গোলার প্রয়োজন নেই। আপাতত সব ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে আচরিত হোক। লোক দেখানেপনার কোনো প্রয়োজন নেই। অতি চিৎকার করে বললেও এটা প্রতিষ্ঠিত হবে না, যে তুমি শ্রেষ্ঠ।

ভড়ং ছেড়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে না পারলে সমূহ বিপদ। পুজো একটা সামগ্রিক বড়ো মাপের ঘুষ প্রথা। জনগণ খুব ভালো ভাবে এটা রপ্ত করেছে। একা জাস্টিস গাঙ্গুলি আর কতো বাঁধ দেবেন!

(চলবে)

ইতিহাস সাক্ষী

—তিনের পাতার পর

মার্চ ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব-কে ফাঁসি দিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। সারা দেশ উত্তাল সে সময় আরএসএস সামিল হয়নি। ১৯৩০ সালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ 'বিনয়-বাদল-দীনেশ'-এর ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধ, ১৯৩০-৩২ সালে চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, প্রীতিলতার শহিদ হওয়া, ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৪৬ সালে নৌ বিদ্রোহ, ওই বছরের ২৯শে জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘট। প্রতিটি ঘটনাতেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পুরো দেশবাসী যখন গর্জে উঠেছিল, আমাদের দেশের মহান বিপ্লবীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেই সময় আরএসএস তাদের প্রভু ব্রিটিশদের খুশি করতে সবকটি ঘটনাতেই নিষ্ক্রিয় ছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে গোলওয়ালকর বলেছিলেন, ''এই সংগ্রামের ফল খারাপ হতে বাধ্য।'' ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন মহাত্মা গান্ধি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন, সেই সময় আরএসএস-এর নেতারা গৃহমন্ত্রকের সচিবের সাথে দেখা করেন এবং সংঘের সদস্যরা আরও বেশি করে সিভিক গার্ড হিসাবে যোগদান করবে, এই মর্মে সচিবকে আশ্বস্ত করেন। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধি আইন অমান্যর ডাক দিয়েছিলেন। হেডগেওয়ার সব জায়গায় খবর পাঠালেন সংঘ এই সত্যাগ্রহে অংশ নেবে না। সংঘের কোনও দায়িত্বশীল কার্যকর্তা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ১৯২৫ সালের প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই আরএসএস কেবলমাত্র চেষ্টা করেছে ভারতীয় জনগণের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইকে ক্রমাগত বিপথগামী করবার। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪২ সালের আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তিনি তখন ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সদস্য। ১৯৪২-এর ২৬শে জুলাই শ্যামাপ্রসাদ বাংলার গভর্নর জন হার্বাটকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ''আপনাদের একজন মন্ত্রী হিসাবে আমি পূর্ণ সহযোগিতা জানাচ্ছি।'' শুধু তা-ই নয়, তিনি আরও বলেন, ''যুদ্ধ চলার সময় যদি কেউ জনতার আবেগ উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়, সরকার যেন তার প্রতিরোধ করে।'' ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বে এবং শ্যামপ্রসাদ মুখার্জির পরিচালনায় ব্রিটিশ সরকারের মদতে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন, ''এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় জাতীয় গভর্নমেন্ট এমনভাবে গঠিত হবে যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতায় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়।'' ভারত ছাড়ো আন্দোলন শ্যামাপ্রসাদের কাছে 'অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা' ও 'নাশকতামূলক' কাজকর্ম। তাই তিনি মনে করেছেন এই আন্দোলন দমন করা উচিত এবং কীভাবে এই আন্দোলন দমন করা যায় তার একটা তালিকাও তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ বীরত্বের সাথে লড়াই করছিল, সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তার জন্য আগ বাড়িয়ে বললেন, ''বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য একটা গৃহবাসিনী গঠনের অধিকার আমাদের দেওয়া হউক।'' শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে না থেকে ব্রিটিশের পক্ষে ছিলেন। হিন্দু মহাসভা থেকে 'জনসংঘ' গড়ে তুলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। আর সেই জনসংঘ থেকেই জন্ম আজকের 'ভারতীয় জনতা পার্টি' বা বিজেপি-র। সেই বিজেপিই আজ দেশপ্রেমের ধ্বনি তুলছে। শ্যামাপ্রসাদের নামে নামাঙ্কিত করেছে কলকাতা বন্দরের।

বিজেপি ও আরএসএস-এর প্রাণপুরুষ বিনয়ক দামোদর সাভারকার বন্দি থাকার সময় ৬ বার মুচলেকা দেন। ১৯১১ সালের ৩০ আগস্ট তিনি ক্ষমাভিক্ষার আবেদন করে লেখেন, ''আমার মুক্তি আমাকে নতুন জন্ম দেবে! মুক্তি আমার এতটাই হৃদয় ছুঁয়ে যাবে যে আমি রাজনীতিগতভাবে আপনাদের কাজে আসবো।'' ১৯১৪ সালের ১৪ই নভেম্বর সাভারকার আবার ক্ষমাভিক্ষার আবেদন করে লেখেন, ''...সরকার যদি তাদের বহুমুখী দয়ার দানে আমাকে একটু মুক্তি করে দেন তবে আমি কিছু পারি না পারি চিরদিন সাংবিধানিক প্রগতি এবং ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক হয়ে থাকবো।''

১৯২১ সালে ছাড়া পাওয়ার পর সাভারকার ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে আর কখনো কিছু বলেননি। তিনিই একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে মাসিক পেনশন পেতেন। ১৯৪২ সালে উত্তরপ্রদেশের বটেশ্বরে বিক্ষোভস্থল থেকে পুলিশ আটক করে অটলবিহারী বাজপেয়ীকে। গ্রেফতার এড়াবার জন্য তিনি শুধু মুচলেকা দিলেন না ধরিয়ে দিলেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্থানীয় দুই নেতা শিবকুমার এবং লীলাধর বাজপেয়ীকে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিন, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, আরএসএস মুখপত্র দ্য অর্গানাইজার-এ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে সংঘ সরাসরি ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার বিরোধিতা করে এবং লেখে যে, ''এটা কোনওদিন হিন্দুদের নিজেদের পতাকা হবে না, হিন্দুরা একে সম্মানও করবে না।'' স্বাধীনতা লাভের কয়েকমাস পরে, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস সদস্য নাথুরাম গডসে মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করে এবং আরএসএস-এর বিভিন্ন শাখায় মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অথচ এদের উত্তরসূরিরাই আজ দেশর মানুষকে সার্টিফিকেট বিলি করছে কে দেশপ্রেমিক আর কে দেশপ্রেমিক না।

তাই ইতিহাস বইয়ের পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেললেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন আরএসএস নেতার নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কমিউনিস্টদের লড়াই-এর কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে আছে। গর্বের ইতিহাসে আছে ভগৎ সিং-এর ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের রোমহর্ষক ইতিহাস, মুজফফর আহমেদের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর লড়াই।

ইতিহাস আরএসএস-কেও মনে রেখেছে আবার কমিউনিস্টদেরও মনে রেখেছে। পার্থক্য একটাই, কেউ ব্রিটিশ সরকারকে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়েছে আবার কেউ সারাজীবন নিজের আদর্শের জন্য দেশের জন্য ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী।

মিছিল জেলার সর্বত্র

—প্রথম পাতার পর

সামনে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। একইভাবে নিভুজী মোড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বুদবুদ গলসী জোনাল কমিটির উদ্যোগে পথসভা অনুষ্ঠিত হয় গলসী বাজারে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ দাস, জোনাল কমিটির সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী।

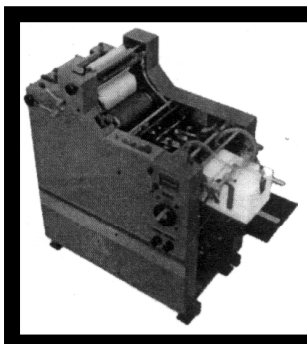

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

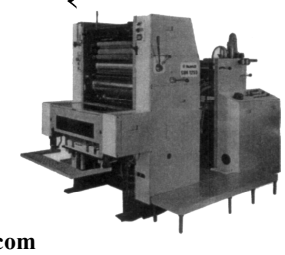

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা